হাঁস পালন নির্দেশিকা

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা-১৩৪১

রচনায়

ড. হালিমা খাতুন	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই
ড. শাকিলা ফারুক	মহাপরিচালক, বিএলআরআই
মোঃ মিজানুর রহমান মানু	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই
ড. মোঃ সাজেদুল করিম সরকার	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই
ড. মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই
ড. সাবিহা সুলতানা	ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই
মোঃ ইউসুফ আলী	ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই
মোঃ তারেক হোসেন	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই

সম্পাদনায়
ড. শাকিলা ফারুক
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

সহযোগী সম্পাদক
মোঃ জাহিদুল ইসলাম
প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

বিএলআরআই প্রকাশনা নং- ৩৬৬
১ম সংস্করণ: ৫০০ (পাঁচশত) কপি
প্রকাশকাল: নভেম্বর, ২০২৪

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা-১৩৪১
ফোন : +৮৮-০২-২২৪৪৯১৬৭০-৭২
ফ্যাক্স : +৮৮-০২-২২৪৪৯১৬৭৫
ই-মেইল : dg@blri.gov.bd
ওয়েবসাইট : www.blri.gov.bd

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	ভূমিকা	৪
২.	হাঁসের বিভিন্ন জাত	৫
৩.	হাঁসের বাসস্থান ও ঘরের ব্যবস্থাপনা	১২
৪.	হাঁসের ব্রুডিং, মেঝে এবং পানি ব্যবস্থাপনা	১৫
৫.	হাঁসের বাচ্চার আলোক ব্যবস্থাপনা	১৭
৭.	হাঁসের বাচ্চা পানিতে ছাড়ার সময়	১৯
৮.	হাঁসের খাদ্য ব্যবস্থাপনা	২০
৯.	হাঁসের ডিম সংরক্ষণ	২৬
১০.	হাঁসের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা	২৮
১১.	টিকা দেওয়ার সাধারণ নিয়মাবলি	৩০
১২.	টিকা সংরক্ষণ	৩১

হাঁস পালন

ভূমিকা

হাঁস পালন শত শত বছর ধরে বাংলাদেশের কৃষি পরিবারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা দেশের সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং রন্ধন ঐতিহ্যের সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের অনন্য ভৌগোলিক প্রাকৃতিক পরিবেশ, যা অসংখ্য নদী, পুকুর এবং জলাভূমি দ্বারা আচ্ছাদিত, যা হাঁস পালনের জন্য একটি আদর্শ পরিবেশ। হাঁস পালনের এই ঐতিহ্যবাহী দিকটি সময়ের সাথে সাথে বিকশিত হয়েছে, হাঁসের পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে আধুনিক কৌশলগুলির সাথে ট্রেডিশনাল পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটেছে। বাংলাদেশে হাঁস পালন নিছক জীবিকার উপায় নয়; এটি একটি বহুমুখী প্রয়াস যা গ্রামীণ সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে। প্রোটিন-সমৃদ্ধ মাংস ও ডিম উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য একটি সম্পূরক আয়ের উৎস প্রদান করা থেকে শুরু করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মুখোমুখি হওয়া বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় হাঁস পালন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হাঁস যেকোন পরিবেশের সাথে খাপ খেতে পারে। হাঁস সাধারণত পুকুরে বা খোলা মাঠে বড় হয়, যেখানে তারা জলজ উদ্ভিদ, পোকামাকড় এবং অবশিষ্ট শস্যের মতো প্রাকৃতিক খাদ্য খেয়ে থাকে। যা খামারীদের হাঁস পালনে উৎসাহিত করে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যে অবদান রাখতে হাঁস পালনের সম্ভাবনার একটি ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতি রয়েছে। সরকারি উদ্যোগ, বেসরকারি সংস্থা উন্নয়ন সংস্থাগুলির সমর্থনসহ, বিভিন্ন হস্তক্ষেপের মাধ্যমে হাঁস পালনের উৎপাদনশীলতা এবং লাভজনকতা উন্নত করার লক্ষ্য রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে উন্নত জাতের প্রবর্তন, টিকাদান কর্মসূচি, আধুনিক ব্যবস্থাপনা অনুশীলনের প্রশিক্ষণ, ক্রেডিট ও বাজারে প্রবেশাধিকার। অধিকন্তু, হাঁসের মাংস ও ডিমের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বাংলাদেশে হাঁস পালনের খাতের সম্প্রসারণ ও বাণিজ্যিকীকরণের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে। উদ্যোক্তারা উৎপাদনশীলতা এবং দক্ষতা বাড়াতে নিয়ন্ত্রিত খাওয়ানো, আবাসন এবং রোগ ব্যবস্থাপনার মতো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেমি-ইনটেনসিভ এবং ইনটেনসিভ উৎপাদন ব্যবস্থায় বিনিয়োগ করছেন। এই অগ্রগতি সত্ত্বেও, রোগের প্রাদুর্ভাব, চিকিৎসা পরিষেবাগুলিতে কিছু সমস্যা এবং পরিবেশগত অবনতির মতো চ্যালেঞ্জগুলি বাংলাদেশে হাঁস পালন শিল্পের টেকসই বৃদ্ধির জন্য অন্তরায়। এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করার জন্য সরকারি সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, খামারী সমবায় এবং বেসরকারি সংস্থাগুলি সহ সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের থেকে সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

সর্বোপরি, বাংলাদেশে হাঁস পালন একটি গতিশীল ও বিকশিত খাত যা খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন এবং গ্রামীণ উন্নয়নে অনেক অবদান রাখতে পারে। ট্রেডিশনাল জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এবং আধুনিক উদ্ভাবনকে একীভূত করার মাধ্যমে, বাংলাদেশে হাঁস পালন শিল্পকে আরও বেগবান করতে পারে।

হাঁসের বিভিন্ন জাত

দেশে সাধারণত তিন ধরনের হাঁসের জাত দেখা যায় - (১) মাংস উৎপাদক (২) ডিম উৎপাদক (৩) ডিম এবং মাংস উভয় উৎপাদক

১। মাংস উৎপাদক হাঁসের জাত

পিকিন হাঁস

পালকের রং : সাদা
চামরার রং : হলদে
পা, পায়ের নলা ও ওয়েবের রং : লালচে কমলা
ঠোঁটের রং : হলদে কমলা
শারীরিক ওজন : হাঁসা-৩.৫ থেকে ৪ কেজি, হাঁসী-৩ থেকে ৩.৫ কেজি
বাৎসরিক ডিম উৎপাদন : ১৫০-১৬০ টি
দেহের ধরন : লম্বা, প্রশস্ত, গভীর, বক্ষস্থল পূর্ণ এবং কিলবোন বড়।
উপযোগিতা : এরা সাধারণত মাংসের জন্য উত্তম, দৈহিক বৃদ্ধি দ্রুত ঘটে, এরা যেকোন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

মাসকোভি হাঁস

পালকের রং : সাদা অথবা কালো-সাদা

শারীরিক ওজন : হাঁসা ৪.৬-৬.৮ কেজি এবং হাঁসী : ৩ থেকে ৩.৬ কেজি

দেহের ধরন : লম্বা, প্রশস্ত, গভীর, বক্ষস্থল পূর্ণ এবং কিলবোন বড়।

ঝুঁটি বেশ শক্ত যা চোখ এবং নাকের উপরিভাগে দেখা যায়।

উপযোগিতা : এরা সাধারণত মাংসের জন্য উত্তম, এরা যেকোন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

বাৎসরিক ডিম উৎপাদন : ৭৫-৯০ টি।

২। ডিম উৎপাদক হাঁসের জাত

জেন্ডিং হাঁস

পালকের রং: হাঁসা-ব্রোঞ্জ, হাঁসী-খাকী রংয়ের তবে মাঝে মাঝে সাদা দাগ আছে।

পা, পায়ের নলা ও ওয়েবের রং: হাঁসা-হলদে কমলা, হাঁসী-খাকী

ঠোঁটের রং: হাঁসা-সবুজাভ নীল, হাঁসী-সবুজাভ থেকে হালকা ব্ল্যাক

শারীরিক ওজন: হাঁসা-১.৫ থেকে ২.৫ কেজি, হাঁসী-১ থেকে ১.৫ কেজি

বাৎসরিক ডিম উৎপাদন: ২৮০-৩২০ টি

দেহের ধরন: আটসাঁট, লম্বা, হালকা এবং ইন্ডিয়ান রানারের মতো ঊর্ধ্বমুখী বৈশিষ্ট্য

উপযোগিতা: এরা সাধারণত ডিমের জন্য উত্তম। এরা যেকোন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

খাকী ক্যাম্পবেল হাঁস

পালকের রং: খাকী

পা, পায়ের নলা ও ওয়েবের রং: হাঁসা-হলদে কমলা, হাঁসী-খাকী

শারীরিক ওজন: হাঁসা-২.০ থেকে ২.৫ কেজি, হাঁসী-১ থেকে ১.৫ কেজি

বাৎসরিক ডিম উৎপাদন: ২৫০-৩০০ টি

দেহের ধরন: এর দেহ দীর্ঘ বা সম্প্রসারিত।

উপযোগিতা: এই হাঁস সাধারণত ডিমের জন্য প্রসিদ্ধ। কখনো কুঁচে হয় না। যেকোন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

ইন্ডিয়ান রানার

পালকের রং: সাদা

পা, পায়ের নলা ও ওয়েবের রং: হলদে কমলা

শারীরিক ওজন: হাঁসা-১.৫ থেকে ২.৫ কেজি, হাঁসী-১ থেকে ১.৫ কেজি

বাৎসরিক ডিম উৎপাদন: ২৫০-২৭৫ টি

দেহের ধরন: আটসাঁট, লম্বা শরীর, মাখাটা উপরের দিকে সোজা থাকে। এর দেহ সম্প্রসারিত।

উপযোগিতা: এরা সাধারণত ডিমের জন্য প্রসিদ্ধ। এরা যেকোন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

৩। ডিম এবং মাংস উভয় উৎপাদক হাঁস: মাংস এবং ডিমের জন্য বিখ্যাত খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁস। এছাড়াও বিএলআরআই উন্নয়নকৃত বিএলআরআই ১ এবং বিএলআরআই ২ হাঁসও মাংস এবং ডিমের জন্য ভালো। এই হাঁসগুলো বছরে ২০০-২২০টি ডিম দিয়ে থাকে এবং গড়ে হাঁসার ওজন ১.৯ কেজি এবং হাঁসীর ওজন ১.৫ কেজি হয়ে থাকে।

বিএলআরআই হাঁস ১

পালকের রং: সাদা

পা, পায়ের নলা ও ওয়েবের রং: হলদে কমলা

শারীরিক ওজন: হাঁসা-১.৮ থেকে ২.২ কেজি, হাঁসী-১.৫ থেকে ১.৯ কেজি

বাৎসরিক ডিম উৎপাদন: ২০০-২২০ টি

দেহের ধরন: আটসাঁট, প্রশস্ত, এদের দেহ সম্প্রসারিত।

উপযোগিতা: এরা কুঁচে হয় না। এরা যেকোন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

বিএলআরআই হাঁস ২

পালকের রং: পুরো শরীর কালো তবে গলা থেকে বুকের কিছু অংশ সাদা

পা, পায়ের নলা ও ওয়েবের রং: হলদে কমলা

শারীরিক ওজন: হাঁসা-১.৫ থেকে ১.৭ কেজি, হাঁসী-১.২ থেকে ১.৫ কেজি

বাৎসরিক ডিম উৎপাদন: ২০০-২২০টি

দেহের ধরন: আটসাঁট, প্রশস্ত ও দেহ সম্প্রসারিত।

উপযোগিতা: এরা কুঁচে হয় না। এরা যেকোন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

হাঁসের বাসস্থান ও ঘরের ব্যবস্থাপনা

হাঁস সব আবহাওয়াতেই মানিয়ে নিতে পারে। তবে খুব বেশী গরম ও বেশী ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না। হাঁসের ঘর নির্মাণ করতে গিয়ে বেশী খরচ না করে সীমিত খরচের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। পুকুরপাড়ে কিংবা পুকুরের উপর ঘরটি তৈরি করতে পারলে ভালো হয়। ঘরের উচ্চতা ৬-৭ ফুট হলে ভালো হয়। ঘর তৈরিতে বাঁশ, বেত, টিন, ছন, খড় ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে ইট দিয়ে মজবুত করে ঘর তৈরি করতে পারলে ভালো হবে।

স্থান নির্বাচন

- হাঁস পালনের জন্য তাদের আবাসস্থল জলাশয়ের নিকটবর্তী হলে ভালো।
- খোলামেলা উঁচু ও রৌদ্র থাকে এমন জায়গা নির্বাচন করা উচিত।
- সেড থেকে পানি বের হওয়ার জন্য ভালো ড্রেনেজ ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ঘরের আশেপাশে বেশি গাছপালা বা জঙ্গল এবং মুরগির খামার থাকা ঠিক নয়।
- হাঁসের সংখ্যা এবং কি ধরনের হাঁস পালন করা হবে তা বিবেচনা করে ঘরের ধরন নির্বাচন করতে হবে।

হাঁসের ঘর

- হাঁসের ঘর একটু ঢালু হবে যাতে পানি নিষ্কাশন ভালোভাবে হতে পারে।
- হাঁসের ঘরের মুখ উত্তর, উত্তর পূর্বদিকে হবে এবং ঘরের পিছনের দিকের উচ্চতা হবে ২ মিটার।
- পোল্ট্রির যেকোন শেড হাঁসদের আবাসস্থল হিসাবেও ব্যবহার করা সম্ভব।
- হাঁসের ঘর অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শুকনা এবং পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ঘরের চারপাশে পাকা দেওয়াল না হলেও তারের বেড়া ব্যবহার করা যেতে পারে এবং ঘরের ছাদ টিন/পাকা ছাদ/খড়ের হোক না কেন মেঝেটি পাকা হওয়া আবশ্যক।
- হাঁস পালন এর জন্য শেডে হাঁস ও মুরগি একসঙ্গে রাখা উচিত নয়।
- আর্দ্রতা এবং ডিম ভাঙ্গা প্রতিরোধে মেঝেতে লিটার দিতে হবে। লিটার হিসাবে কাঠের গুড়া বা ধানের তুষ ব্যবহার করা যেতে পারে এবং লিটারের গভীরতা হবে ৭-৮ সে. মি.।

খামারের নকশা

- বাড়ন্ত এবং বয়স্ক হাঁসের আলাদা ঘর থাকতে হবে।
- বাড়ন্ত এবং বয়স্ক হাঁসের ঘর থেকে আলাদা পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকবে।
- কম খরচে কিন্তু শক্ত ও দক্ষতার সাথে বানাতে হবে।
- একই ঘরে একসাথে স্লেট এবং লিটার এর ব্যবস্থা থাকতে পারলে ভালো হবে। এতে মেঝে কম ভেজা থাকবে ও ডিম উৎপাদন ভালো হবে।
- খাদ্য এবং পানির পাত্র স্লেটের উপর থাকবে। লিটার অংশে হাঁস মেটিং এবং ডিম পাড়বে। একই ঘরে একসাথে স্লেট এবং লিটার হাঁসের পায়ের ক্ষত হওয়া থেকে প্রতিরোধ করে যা স্লেটে সব সময় থাকলে এই ক্ষত বেশী হতে দেখা যায়।

পালন পদ্ধতি

সাধারণত পাঁচটি পদ্ধতির মাধ্যমে হাঁস পালন করা যায়। পদ্ধতিগুলি হল: ১. আবদ্ধ পদ্ধতি ২. অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতি ৩. মুক্ত রেঞ্জ পদ্ধতি ৪. হার্ডিং পদ্ধতি এবং ৫. ল্যানটিং পদ্ধতি।

১. আবদ্ধ পদ্ধতি: আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁস গভীর লিটারে লালন-পালন করা হয়। তবে এই পদ্ধতিতে হাঁস কেজে এবং তারের জালির ফ্লোরেও পালন করা হয়। হাঁস প্রতি ৩ বর্গ ফুট জায়গা প্রয়োজন। হাঁসের বাচ্চার বয়স ১৭ সপ্তাহ হওয়ার সাথে সাথে তাদের হাঁসের প্লেগের বিরুদ্ধে পুনরায় টিকা দেওয়া হয় এবং তখন প্রতি হাঁসের জন্য প্রায় ৫ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন হয়। হাঁসের বাচ্চা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং তাই সব ধরনের পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ রেশনের প্রয়োজন হয়। ডিমপাড়া হাঁস ২০ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত প্রায় ১২.৫ কেজি খাদ্য গ্রহণ করে। পরবর্তীতে উৎপাদনের হার এবং সবুজ শাক-সবজির প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে প্রতিদিন প্রতি হাঁস ১২০-১৭০ গ্রাম পর্যন্ত খেয়ে থাকে। স্টার্টার, গ্রোয়ার এবং লেয়ার রেশনে প্রতি কেজি ফিডে যথাক্রমে ৩০০০, ২৯০০ এবং ২৮৫০ কিলোক্যালরী বিপাকীয় শক্তি (ME) সহ ২০, ১৮ এবং ১৬% প্রোটিন থাকতে হবে।

আবদ্ধ পদ্ধতি

২. অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে হাঁসগুলো রাতে ঘরে আবদ্ধ থাকে এবং দিনের বেলায় ঘরের সামনে বা আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। খাদ্য ঘরে বা যেখানে ঘুরে বেড়ায় সেখানে দেয়া যেতে পারে (১০-১২ বর্গফুট চারন)। ঘরের সামনে একটি চৌবাচ্চা যার প্রস্থ ২০ ইঞ্চি এবং গভীরতা ৮ ইঞ্চি দেয়া যেতে পারে যাতে হাঁসগুলো সহজে পানি খেতে এবং গোসল করতে পারে। এই পদ্ধতিতে হাঁসের খাবারের রেশনের এক তৃতীয়াংশ স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন সস্তা সবজি, সংসারের ফেলে দেওয়া ভাত, চাল ধোওয়া পানি, তড়কারির খোসা, মাছের আঁশ-কাটা এবং সব সময় যত পারা যায় গুগলি-শামুক দিতে হবে।

অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতি

৩. মুক্ত রেঞ্জ পদ্ধতি: ফ্রি রেঞ্জ সিস্টেমে, হাঁসের বাচ্চাদের দৌঁড়ানোর এবং রাতের আশ্রয়ের জন্য যথেষ্ট জায়গা দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার অধীনে প্রতি একরে (০.০৪৫৬ হেক্টর) ২০০০টি হাঁস পালন করা যায়। ফি রেঞ্জ সিস্টেমে হাঁস তাদের বেশিরভাগ প্রোটিন পায় ছোট মাছ, শামুক এবং পোকামাকড় খাওয়ার মাধ্যমে।

মুক্ত রেঞ্জ পদ্ধতি

৪. হার্ডিং পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে হাঁস পালনের জন্য কোন প্রকার ঘর দেয়া হয় না। যে সকল জায়গায় খাবার আছে সে সমস্ত এলাকায় হাঁসগুলিকে নিয়ে যাওয়া হয়। হাঁস সারাদিন ঐ সকল এলাকা থেকে খাদ্য গ্রহণ করে এবং রাতের বেলায় কোন একটি উঁচু জায়গায় আটকিয়ে রাখা হয়। এভাবে হাঁসগুলোকে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় কিছুদিন খাওয়ানোর পর অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়।

হার্ডিং পদ্ধতি

৫. ল্যানটিং পদ্ধতিঃ এই পদ্ধতিতে বড় বড় হাওড়, বিল, জলাশয় এর আশপাশে ঘর তৈরী করে হাঁস পালন করা হয়। হাঁসগুলো রাতের বেলায় ঘরে থাকে এবং দিনের বেলায় হাওড়, বিল, এবং জলাশয় থেকে খাবার সংগ্রহ করে খায়। প্রতিটি ফ্লকে ১০০-৩০০টি হাঁস থাকে।

লেন্টিং পদ্ধতি

ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা

সাধারণত হাঁসের বাচ্চাকে নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত কৃত্রিম উপায়ে তাপ দিয়ে লালন-পালন করাকে ব্রুডিং বলে। শীতকালে ৩-৪ সপ্তাহ এবং গ্রীষ্মকালে ২-৩ সপ্তাহ পর্যন্ত হাঁসের বাচ্চার ব্রুডিং করতে হয়। বাচ্চার দেহে তাপ নিয়ন্ত্রণের কলা কৌশল বৃদ্ধি পায় না বলে ব্রুডিং করতে হয়। দু'ভাবে তাপ প্রদান করে হাঁসের বাচ্চা ব্রুডিং করা যায়।

হাঁসের বাচ্চার ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা

- ব্রুডিংকালে হাঁসের বাচ্চার মৃত্যুহার খুব বেশী হয়ে থাকে। তাই এসময় বাচ্চার যত্নে প্রয়োজনীয় কৃত্রিম তাপ, আলো ও বায়ু চলাচল এর সুব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- বাচ্চা ব্রুডিং ঘরে নেয়ার ১২-১৪ ঘণ্টা পূর্ব থেকেই ঘর গরম (২৮-৩১ ডিগ্রী সেঃ) করে রাখতে হবে। তা না হলে ঠান্ডাজনিত রোগ (নিউমোনিয়া), ডায়রিয়া ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হবে এবং নাভী শুকাতে দেরি হবে। এছাড়াও তাপমাত্রা ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে অনুসরণ করলে বাচ্চা মৃত্যুহার অনেক কম হয়, প্রায় ২০ শতাংশ থেকে ৩-৪ শতাংশে নেমে আসে।

- ব্রুডারের নিচে পর্যাপ্ত তাপের জন্য প্রথম সপ্তাহে ব্রুডারে মেঝে থেকে ৩-৪ ফুট উঁচুতে এবং ৩য় সপ্তাহ থেকে ৭-৮ ফুট উঁচুতে ১০০ ওয়াটের ৪-৫ টি বাল্ব ঝুলিয়ে আলো এবং তাপ দেয়া প্রয়োজন।
- শীতকালে সাধারণত ৩-৪ সপ্তাহ এবং গরমকালে ২-৩ সপ্তাহ ব্রুডিং করতে হবে। ইলেকট্রিক বাল্ব, গ্যাসের চুলা, কেরোসিনের চুলা, বিএলআরআই উদ্ভাবিত নন ইলেকট্রিক চিক ব্রুডার দিয়ে ব্রুডিং করা যায়।

হাঁসের বাচ্চার প্রাথমিক পরিচর্যা

- বাচ্চা ফার্মে প্রবেশ করানোর পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাচ্চাকে ব্রুডারে ছাড়তে হবে।
- বাচ্চাকে প্রথম ১ ঘণ্টা শুধু পানি পান করতে দিতে হবে (প্রয়োজনে ভিটামিন সি বা গ্লুকোজ মিশ্রিত পানি দিতে হবে)
- পানি পানের ১ ঘণ্টা পর খাদ্য পরিবেশন করতে হবে (পেপার অথবা ফিডারে)
- হাঁসের ফ্লকের খাদ্য গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রতি ৩ ঘণ্টা পরপর খাদ্য দিতে হবে।
- অল্প অল্প কিন্তু বারবার খাদ্য পরিবেশন করলে বাচ্চার খাদ্যের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে, সঠিক ওজনে আসে এবং অসমতা কম দেখা যায়। যেহেতু প্রথম দিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই বাচ্চা খাদ্য ও পানি ঠিকমত গ্রহণ করল কিনা তা অবশ্যই পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- প্রথমদিন বাচ্চা ক্ষুধার্ত থাকায় ও সঠিক পরিবেশ পেলে খাদ্যথলি ভর্তি করে খাবে এবং বাচ্চা গ্রহণের ৮ ঘণ্টা ও ২৪ ঘণ্টা পর হাতে নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে সেটা বুঝা যাবে।

মেঝের স্থান

হাঁসের ঘরে গাদাগাদি করে হাঁস রাখলে তাদের স্বাস্থ্য, বৃদ্ধি বা ডিম উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে। হাঁস থেকে ভালো উৎপাদন পেতে হলে পর্যাপ্ত মেঝের স্থান দিতে হবে।

সারণি ১ : হাঁসের জন্য প্রয়োজনীয় ফ্লোর স্পেস

বয়স (দিন)	জায়গা (প্রতি হাঁস, স্কয়ার ফিট)
১	০.৩২
২	০.৬২
৩	১.১০
৪	১.৪৭
৫	১.৯০
৬	২.২৮
৭	২.৪৮
লেয়ার	৩.০২

লিটার এবং উঠোন ব্যবস্থাপনা

হাঁস, মুরগি বা টার্কির চেয়ে বেশি পানি পান করে এবং পানি যুক্ত মল ত্যাগ করে। তাদের ড্রপিংয়ে ৯০% এর বেশি আর্দ্রতা থাকে। তাই ঘরের ভিতরে লিটার শুষ্ক অবস্থা বজায় রাখার জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এর জন্য নিয়মিত ফ্রেস লিটার যোগ করতে হবে, লিটারের উপরের যতটুকু অংশ ভিজে গেছে বা স্যাঁতস্যাতে হয়ে গেছে এবং প্রয়োজনে, সেই অংশটুকুর লিটার ফেলে ফ্রেস লিটার দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হবে। অর্ধ আবদ্ধ পদ্ধতিতে বেড়ে ওঠা, যে হাঁসের বাচ্চা দিনের বেলায় তাদের বেশিরভাগ সময় ঘরের বাইরে কাটায় (প্রথম ৩ সপ্তাহের পরে), তাদের ক্ষেত্রে পানির পাত্র যতটা সম্ভব ঘর থেকে দূরে রাখা উচিত। এটি লিটারে জল পড়া কমিয়ে দেবে।

পানি ব্যবস্থাপনা

- বিশুদ্ধ পানি এবং ত্রুটিযুক্ত পানির পাত্র সরবরাহ করতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে বাচ্চার ঘরে পানির পাত্রে যেন সবসময় পানি থাকে।
- প্রতি ৪ ঘণ্টা পর পর পানি পরিবর্তন করে দিতে হবে।
- ব্রুডিং এর সময় ঘরের সর্বত্র সমান দূরত্বে এমন ভাবে পানির পাত্র স্থাপন করতে হবে যেন বাচ্চা সহজে পানি গ্রহণ করতে পারে।

হাঁসের বাচ্চার আলোক ব্যবস্থাপনা

- হাঁসের বাচ্চাদের পানি এবং খাওয়া শুরু করতে সহায়তা করার জন্য প্রথম কয়েক দিন কৃত্রিম আলো গুরুত্বপূর্ণ। বাচ্চাদের অধিক হারে খাদ্য গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য সার্বক্ষণিক আলো প্রদান করা প্রয়োজন।
- ব্রুডিং এর শুরু থেকেই প্রতিরাতে আধাঘণ্টা থেকে ১ ঘণ্টা আলো বন্ধ রেখে বাচ্চাদের অন্ধকারের সাথে পরিচিত করানো উচিত। তা না হলে রাতে হঠাৎ আলো বন্ধ হলে বাচ্চা ভয়ে জড়ো হয়ে পাইলিং (চাপাচাপি) করে মারা যেতে পারে। সঠিক মাত্রার আলোতে বাচ্চা পানি ও খাদ্যের অবস্থান চিনতে পারে এবং খাদ্য ও পানি খেতে অভ্যস্ত হয়।

ডিমপাড়া হাঁসের আলোক ব্যবস্থাপনা

সম্পূরক আলোর ব্যবস্থা করা হলে হাঁসের ডিম পাড়ার সময়কালের দৈর্ঘ্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পেতে পারে। যদি সম্পূরক আলো প্রদান করা না হয় তাহলে ডিম উৎপাদন মৌসুমী এবং প্রাকৃতিক দিনের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। ডিম পাড়ার সময়কালে দৈনিক ১৪-১৬ ঘণ্টা আলো প্রয়োজন। তাই দিনের দৈর্ঘ্য বাড়ানোর জন্য কৃত্রিম আলো যোগ করতে হবে এবং লাইটিং অবস্থা ঠিকঠাকমতো প্রয়োগ করলে ৭-১২

মাস একটানা ডিম পাড়বে। আমাদের দেশে শীতকালে দিন ছোট হয়, এই কারণে হাঁস দিনের আলো কম পায়। আবার গ্রীষ্মকালে দিন বড় হয়, তাই হাঁস দিনের আলো বেশি পায়। সঠিক সময়ে কৃত্রিম আলো পুলেটের যৌন পরিপক্কতা অর্জনে সহায়তা করে এবং ডিম উৎপাদনের উপর এর প্রভাব রয়েছে। দিনের দৈর্ঘ্যের সাথে মিলিয়ে ১৮ সপ্তাহ বয়স থেকে ১২ ঘণ্টা আলো প্রদান করতে হবে। এজন্য দিনের দৈর্ঘ্য যদি ১১ ঘণ্টা থাকে তার সাথে ১ ঘণ্টা কৃত্রিম আলো প্রদান করতে হয়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে (সারণি: ২) অনুযায়ী কৃত্রিম আলো প্রদানের সময় বাড়াতে হবে। সূর্যাস্তের সময় হাঁসের ঘরে আলো জ্বালিয়ে কৃত্রিমভাবে দিনের দৈর্ঘ্যকে বাড়ানো যায়।

সারণি ২: খোলা ঘরে আবাসনের ভিত্তিতে ডিমপাড়া হাঁসের আলোক কর্মসূচি

বয়স (সপ্তাহ)	আলোক সময়কাল (ঘণ্টা) প্রাকৃতিক কৃত্রিম আলো +	আলোর প্রখরতা
১৮	১২.০	
১৯	১৩.০	
২০	১৩.৫	
২১	১৪.০	
২২	১৪.৫	২০-৩০ লাক্স
২৩	১৫.০	
২৪	১৫.৫	
২৫-যতদিন ডিম দেয়	১৬.০	

হাঁসের চোখের স্তরে প্রায় ১০ লাক্স আলোর তীব্রতা ড্রেক এবং হাঁসী উভয়ের মধ্যে পর্যাপ্ত যৌন প্রতিক্রিয়া উদ্দীপিত করার জন্য যথেষ্ট। তবে অনুশীলনে, হাঁসের প্রজনন এবং ডিম পাড়ার জন্য সাধারণত হাঁসের স্তরে ২০-৩০ লাক্স সরবরাহ করা হয়। তবে সবসময় হাঁসের জন্য কৃত্রিম আলো কম গুরুত্বপূর্ণ। হাঁস নিশাচর, অন্ধকারে খাবার ও জল খুঁজে পেতে পারে। সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ অবস্থায় মাংস উৎপাদনকারী হাঁসের জন্য সাধারণত প্রতিদিন কিছু আলো সরবরাহ করা উচিত।

আলোক কর্মসূচির মৌলিক নীতিমালা

- বাড়ন্ত বয়সে কখনও আলোক সময়ের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করা যাবে না।
- ডিম পাড়া শুরু হলে আলোক সময়ের দৈর্ঘ্য কমানো যাবে না।
- হাঁসের কাঙ্ক্ষিত শারীরিক ওজন ও বয়সের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে ডিম উৎপাদনের শুরু থেকে ধাপে ধাপে আলো প্রদানের সময়কাল বৃদ্ধি করতে হবে।

- আলো হাঁসের ডিম উৎপাদনে সহায়তা করে। ডিমপাড়া হাঁসের জন্য ১৪-১৬ ঘণ্টা আলো দরকার। যদি দিনের স্বাভাবিক আলো ১৪-১৬ ঘণ্টার কম হয়, তবে কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা করে আলোক দৈর্ঘ্য ১৪-১৬ ঘণ্টা করতে হবে।

বাতাস চলাচল ব্যবস্থা (ভেন্টিলেশন)

হাঁস পানিযুক্ত মলত্যাগ করে। সেইজন্য মেঝে সবসময় ভেজা থাকে। তাই হাঁসের ঘর শুষ্ক রাখার জন্য বাতাস চলাচল খুবই জরুরী। ঘরের দেয়ালের শতকরা ৪০ ভাগ লম্বালম্বি তারের জালের বা বাঁশের সাহায্যে ছিদ্রওয়ালা বেড়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। অনুকূল পরিবেশ ও আবহাওয়ায় লোম গজানো, শারীরিক বৃদ্ধি এবং ডিম উৎপাদন ভালো হয়।

সারণি ৩: হাঁসের বাচ্চা ব্রুডিংকালে প্রয়োজনীয় কৃত্রিম তাপ, আর্দ্রতা ও বায়ু চলাচল ব্যবস্থা

বয়স (সপ্তাহ)	তাপমাত্রা (ডিগ্রী ফাঃ)	আর্দ্রতা (%)	বায়ু চলাচল
১	৯২-৯৫	৫৫-৬০	বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থা থাকলে ঘরের ক্ষতিকর গ্যাস বেরিয়ে যাবে। আর্দ্রতা ঠিক থাকবে ফলে বাচ্চা সুস্থ থাকবে। ঘরের আর্দ্রতা বেশি হলে ককসিডিওসিস ও কৃমি হয়।
২	৮৫-৯২	৫৫-৬০	
৩	৮০-৮৫	৫৫-৬০	
৪	৭৫-৮০	৫৫-৬০	
৫	৭০-৭৫	৬০-৭০	

হাঁসের বাচ্চা পানিতে ছাড়ার সময়

বাচ্চার বয়স চার সপ্তাহ না হওয়া পর্যন্ত পানিতে ছাড়া উচিত নয়। চার সপ্তাহ পর্যন্ত ঘরে লালন পালন করার পর পানিতে ছাড়ার অভ্যাস করতে হবে। পানিতে ছাড়ার সময় প্রথম দিনেই সারা দিন পানিতে রাখা ঠিক নয়, ধীরে ধীরে পানিতে ছাড়ার অভ্যাস করতে হবে। তবে গরমকালে ২-৩ সপ্তাহ বয়স হলেই পানিতে ছাড়া যেতে পারে।

- হাঁসের জন্য সাঁতার কাটা প্রয়োজনীয় নয়, তারপরেও জায়গার সুবিধা থাকলে রানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- ১ মিটার প্রস্থ এবং ০.২০ মি গভীর সিমেন্ট দ্বারা পুকুর বানানো যেতে পারে।
- বিকল্প হিসাবে সসার আকৃতির পুকুর যা ০.২৫ মি গভীর এবং ২ মি প্রস্থ বানানো যেতে পারে।
- পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা অবশ্যই ভালো হতে হবে।

হাঁসের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

পারিবারিকভাবে বা গ্রামাঞ্চলে পালিত হাঁস জলাশয়ে, পুকুর, খাল-বিল এবং ক্ষেতখামারে চড়ে জীবন ধারন করতে পারে এবং এখান থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করে। অনেক খামারিগণ হাঁসকে শুধু ধানের কুঁড়া, চাল, গম এসব খেতে দেয়। বর্ষা মৌসুমে অর্ধছাড়া অবস্থায় পালনকৃত বাচ্চা হাঁসকে দৈনিক ৪০ গ্রাম এবং বয়স্ক হাঁসকে ৬০ গ্রাম হারে সুষম খাদ্য সম্পূরক হিসাবে দিতে হবে। তবে শুষ্ক মৌসুমে প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা কমে যায় বলে এসময় ছেড়ে খাওয়ানোর পাশাপাশি ৭০ থেকে ৮০ গ্রাম খাদ্য সরবরাহ করা দরকার। তবে প্রাকৃতিক খাদ্য না দিতে পারলে হাঁসকে দৈনিক ১৪০-১৫০ গ্রাম হারে খাদ্য দিতে হবে। কিন্তু উন্নত জাতের হাঁস পালনের ক্ষেত্রে বিশেষ যত্নবান হতে হবে। সে ক্ষেত্রে সম্পূরক খাদ্য কমপক্ষে ৩ বার দিতে হবে। তবে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক খাবার যেমন: শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া, কেঁচো, শাপলা, ক্ষুদেপানা, ছোট মাছ ও নানা ধরনের কীটপতঙ্গ মুক্ত অবস্থায় জলাশয়ে পাওয়া গেলে শুধু সকাল ও বিকালে পরিমিত পরিমাণ দানাদার খাবার সরবরাহ করলেই চলবে। হাঁসের খাবারের সাথে প্রচুর পরিমাণ পানি সরবরাহ করতে হয়। হাঁসকে শুষ্ক খাদ্য দেয়া ঠিক নয়। এদের সবসময় ভেজা ও গুঁড়ো খাদ্য দেয়া উচিত। প্রথমে ৮ সপ্তাহ হাঁসকে ইচ্ছামত খেতে দেয়া উচিত পরবর্তীতে দিনে দু'বার খেতে দিলেই চলে ।

ফিডার এবং খাওয়ানোর স্থান

অন্যান্য হাঁস-মুরগির জন্য ব্যবহৃত বেশিরভাগ ফিডারই হাঁসের জন্য সন্তোষজনক। যদি হাঁসকে হাতে খাওয়ানো হয় তবে সাধারণ ট্রফ ফিডারগুলি ভালো কাজ করে। যদি ফিড হপার ব্যবহার করা হয় তবে সেগুলি এমনভাবে তৈরি করা উচিত যাতে খাদ্য খাওয়ার সময় মুখ থেকে পড়ে যাওয়া খাদ্য অবাধে নিচের দিকে স্লাইড করে, তাতে খাদ্য অপচয় কম হবে।

হাঁসের বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে, হাঁসের বাচ্চারা, অনেকটা মুরগির মতোই খায়। হাঁস বড় হওয়ার সাথে সাথে প্রতিবার খাওয়ানোর সময় তাদের খাদ্যনালীতে ক্রমবর্ধমান পরিমাণে খাদ্য সঞ্চয় করতে সক্ষম হয় এবং এইভাবে তাদের ঘন ঘন খাওয়ার প্রয়োজন কম হয়। প্রথম ৩ সপ্তাহের জন্য প্রতি হাঁসের জন্য প্রায় ১ ইঞ্চি (২.৫ সেমি) ফিডার স্পেস দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। প্রজননকারীদের যাদের প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ ফিড খাওয়ানো হচ্ছে তাদের অধিক পরিমাণে খাওয়ানোর জায়গা দেওয়া উচিত যাতে সমস্ত পাখি একবারে খেতে পারে, যার জন্য প্রতি হাঁসের জন্য প্রায় ৪ ইঞ্চি (১০ সে. মি.) রৈখিক স্থান প্রয়োজন।

হাঁসের দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ

হাঁসের দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ হাঁসের জাত, বয়স, খাদ্যের মান, বাসস্থান খাদ্যের আকার ও পরিবেশনের উপর নির্ভর করে।

সারণি ৪: দেশী হাঁসের সপ্তাহ ভিত্তিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ দেয়া হলো

বয়স (সপ্তাহ)	পরিমাণ (গ্রাম)	বয়স (সপ্তাহ)	পরিমাণ (গ্রাম)
১ম	১০-২০	৯ম	৯৫-১০০
২য়	২১-৩১	১০ম	১১০-১১৫
৩য়	৩১-৪১	১১ তম	১১৫-১২০
৪র্থ	৪১-৫৫	১২ তম	১২০-১৩০
৫ম	৫৫-৬০	১৩ তম	১৩০-১৩৫
৬ষ্ঠ	৬৫-৭০	১৪ তম	১৩৫-১৪০
৭ম	৭৫-৮০	১৫ তম থেকে তদুর্ধ	১৪০-১৫০
৮ম	৮৫-৯০		

সারণি ৫: হাঁসের খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টির পরিমাণ

পুষ্টি উপাদান	বাচ্চা হাঁস	বাড়ন্ত হাঁস	ডিমপাড়া হাঁস
এনার্জি (কিলোক্যালরি/কেজি)	৩০০০	২৯০০	২৮৫০
প্রোটিন (%)	২০	১৮	১৬
ক্যালসিয়াম (%)	১.২০	০.৮০	৩.৫০
ফসফরাস (%)	০.৪৫	০.৪০	০.৪৫

সারণি ৬: বিভিন্ন বয়সের হাঁসের খাদ্য তৈরীর সূত্র

খাদ্য উপাদান (%)	হাঁসের বাচ্চা (০-৮ সপ্তাহ)	বাড়ন্ত হাঁস (৯-১৯ সপ্তাহ)	ডিমপাড়া হাঁস ২০ সপ্তাহ-তদুর্ধ)
ভূট্টা ভাঙা	৫৪.০০	৫৪.০০	৫২.০০
চালের কুড়া	১৮.০০	১৭.০০	১৭.০০
সয়াবিন মিল	২২.০০	২৩.০০	২৩.০০
প্রোটিন কনসেনট্রেট	২.০০	২.০০	২.০০
ঝিনুক চূর্ণ	২.০০	২.০০	৩.৫০
ডিসিপি	১.২৫	১.২৫	১.৭৫

খাদ্য উপাদান (%)	হাঁসের বাচ্চা (০-৮ সপ্তাহ)	বাড়ন্ত হাঁস (৯-১৯ সপ্তাহ)	ডিমপাড়া হাঁস ২০ সপ্তাহ-তদুর্ধ)
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.২৫	০.২৫	০.২৫
লাইসিন	০.১০	০.১০	০.১০
মিথিওনিন	০.১০	০.১০	০.১০
লবণ	০.৩০	০.৩০	০.৩০
মোট	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**

হাঁসের ক্ষেত্রে সুষম খাদ্যের গুরুত্ব

- হাঁসের উৎপাদন যেমন; ডিম, মাংস, বাচ্চা ফোটার হার, সুস্থ সবল বাচ্চা বৃদ্ধির হার ভালো হয়।
- দেহের পুষ্টি সাধন করে এবং পুষ্টির অভাবজনিত রোগ ও অন্যান্য রোগ কম হয়।
- শরীরের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে ও হাঁস দ্রুত বেড়ে উঠে।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ও মৃত্যু হার হ্রাস পায়।
- ডিম ও মাংসের গুণগতমান বজায় রাখে।

সুষম খাদ্য সংরক্ষণ

- খাদ্য সংরক্ষণগারে/গুদামে সঠিক বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে যা খাদ্যকে সিক্ত হওয়া থেকে মুক্ত করবে।
- খাদ্যবস্তা মেঝে/মাটিতে না রেখে কিছুটা উঁচুতে তাক বা মাঁচা করে রাখতে হবে।
- খাদ্যবস্তা দেয়াল ঘেঁষে রাখা উচিত নয়।
- খাদ্য গুদাম বিষাক্ত পোকামাকড়, ইদুর এবং কীটপতঙ্গ মুক্ত হতে হবে।
- বৃষ্টির পানি যেন খাদ্য গুদামে প্রবেশ না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- সরাসরি রোদের আলো থেকে দূরে শুষ্ক স্থানে সংরক্ষণ করা উচিত।
- খাবারের ব্যাগের মুখ খোলা থাকলে ব্যাগে বাতাস ঢুকে এবং এই অধিক আর্দ্রতার কারণে ফাংগাস জন্মাতে পারে সে জন্য মুখ বন্ধ রাখতে হবে।
- খাবার খোলা অবস্থায় মাটিতে স্তুপ আকারে রাখা সঠিক নয় কারণ স্তুপে অধিক তাপ উৎপন্ন হয়ে খাদ্যের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়।

খাদ্য উপকরণ

- পাখির খাদ্য তৈরিতে প্রধানত দানাশস্য ও এদের উপজাত ব্যবহার করা হয়।
- রেশন তৈরির জন্য দানাশস্য হিসাবে প্রধানত গম, ভুট্টা ও ভুসি ব্যবহার করা হয়।
- কিন্তু বসতবাড়িতে পারিবারিক হাঁস-মুরগি পালনে যে কোনো শস্যদানা যেমন, ধান, চাল, খুদ, ডাল, সরিষা ইত্যাদি পাখিকে খেতে দেওয়া হয়।
- খাদ্য উপকরণের পুষ্টিমান, প্রাপ্যতা ও বাজারদর বিবেচনা করে রেশন তৈরির জন্য খাদ্য উপকরণ নির্বাচন করতে হবে।

সারণি ৭: নিম্নে পুষ্টি উপাদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে খাদ্য উপকরণের একটি তালিকা দেওয়া হলো

পুষ্টি উপাদান	খাদ্য উপকরণ
শর্করা	গম, ভুট্টা, ধান, চাল, চালের কুড়াঁ, গমের ভুষি ইত্যাদি।
আমিষ	শুটকি মাছের গুড়া, তিলের খৈল, সরিষার খৈল, সয়াবিন মিল, রক্তের গুড়া ইত্যাদি।
স্নেহ	বিভিন্ন উদ্ভিজ তৈল যেমন : পাম তৈল, তিলের তৈল, সয়াবিন তৈল ইত্যাদি।
খনিজ পদার্থ	খাদ্য লবণ, ঝিনুক খোসা চূর্ণ, হাঁড়ের গুড়া, ডিমের খোসা, চুনা পাথর ইত্যাদি।
ভিটামিন	শাকসবজি, ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স ইত্যাদি।
পানি	পরিষ্কার বিশুদ্ধ জীবাণুমুক্ত পানীয় জল।

খাদ্যে মাইক্রো উপাদান নিশ্চতকরণে সাবধানতা

মাইক্রো উপাদান এবং কম পরিমাণে লাগে এমন উপাদান যেমন-ভিটামিন, ডিসিপি, লাইসিন, মিথিওনিন, খনিজ মিশ্রণ, লবণ এগুলো ওজন করে একসঙ্গে ভালোভাবে মিশাতে হবে।

হাঁসের খাদ্যে মাইক্রো উপাদানের ঘাটতি হলে নিম্নরূপ লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়

ভিটামিন: বৃদ্ধির হার কমে যাওয়া, অন্ধত্ব, নরম হাড় ও ঠোঁট, পায়ের দুর্বলতা, পাতলা খোসার ডিম, প্যারালাইসিস ইত্যাদি।

লাইসিন: বৃদ্ধির হার কমে যাওয়া, পালকের রং বদলে যাওয়া, খাদ্য হজমে ব্যাঘাত ঘটে।

মিথিওনিন: বৃদ্ধির হার কমে যাওয়া, ডিম উৎপাদন এবং ওজন কম হওয়া, পালক দুর্বল হওয়া।

খনিজ মিশ্রণ: নরম খোসার ডিম, রিকেটস, নরম হাড়।

সারণি ৮: হাঁসের খাদ্য তৈরীতে বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের ব্যবহার মাত্রা

উপাদান	ব্যবহার মাত্রা (%)	উপাদান	ব্যবহার মাত্রা (%)
ভুট্টা	৬০	শুটকি মাছের গুড়া	১০
গম	৫০	রক্তের গুড়া	৩
চালের কুড়া	২৫-৪০	পোল্ট্রির উপজাত	৫
গমের ভুষি	১০	ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট	১-২
সয়াবিন মিল	৪০	প্রোটিন কনসেনট্রেট	১০
তিলের খৈল	১০	ঝিনুক	১-৩
সূর্যমূখির খৈল	১০	লাইমষ্টোন	১-৩
সরিষার খৈল	৫	এন্টিবায়োটিক	০.১-০.৫
ভিটামিন	উৎপাদনকারীর ব্যবহার মতে		

হাঁসের রেশনে রেডি এবং হাতে বানানো খাদ্য

বর্তমানে বাজারে হাঁসের জন্য বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত রেডি ফিড পাওয়া যায়। আবার অনেক খামারি খাদ্য উপকরণ ক্রয় করে পুষ্টির পরিমাণ সঠিক রেখে রেশন তৈরি করে। নিম্নে রেডি ফিড এবং হাতে বানানো খাদ্যের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা করা হলো:

রেডি ফিড

হাঁস-মুরগির জন্য বর্তমানে বিভিন্ন বাণিজ্যিক খাদ্য বাজারে পাওয়া যায়। এসব খাদ্য অত্যাধুনিক ফিড মিলে তৈরি করা হয়। পাখির বয়স ও উদ্দেশ্য অনুসারে বাজারে ঃ

- ম্যাশ (পাউডার)
- ক্রম্বল (দানা) ও
- পিলেট (বড়ি) আকারের খাদ্য বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।

রেডি এবং হাতে বানানো খাদ্যের সুবিধা ও অসুবিধা

রেডি ফিডের সুবিধা

- রেডিমেড পাওয়া যায়, বানানোর ঝামেলা নেই।
- মানও ভালো যদি কোম্পানী ভালো হয়।
- ফিড মিল ও স্টোর রুমের দরকার নেই।

অসুবিধা

- দাম বেশী।
- খাদ্যের ভালো মন্দ, কোম্পানীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।
- আবহাওয়ার সাথে মিল রেখে বা হাঁসের প্রয়োজন অনুযায়ী খাবার পাওয়া যায় না।

হাতে বানানো খাদ্যের সুবিধা এবং অসুবিধা

সুবিধা

- দাম কম, খাদ্য উপাদানের দাম কম হলে লাভ বেশি হয়।
- উত্তরবঙ্গে যেখানে ভুট্টা পাওয়া যায় সেখানে বস্তায় ৩০০-৪০০ টাকা কমে খাবার বানানো যায়।
- হাঁসের প্রয়োজন অনুযায়ী খাবার বানানো যায়।
- যদি সঠিকভাবে ভালো উপাদান দিয়ে ভালো ফর্মুলার মাধ্যমে খাদ্য বানানো যায় তাহলে হাতে বানানো খাদ্য বেশী ভালো।

অসুবিধা

- প্রতিটি খাদ্য উপাদান কিনতে হবে।
- খাদ্য বানানোর জন্য আলাদা সময় দিতে হবে।
- ভালোমানের খাদ্য উপাদান অনেক সময় পাওয়া যায় না। তাছাড়া খাবারের উপাদানের মান নির্ণয় করার সুযোগ সবার নেই।

রেডি ফিড ব্যবহারের বিবেচ্য বিষয়

- মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ দেখে কিনতে হবে।
- ভালো কোম্পানির ফিড কিনতে হবে।
- ব্যাগের গায়ে পুষ্টি উপাদানের মাত্রা লেখা থাকবে।
- এক মাসের বেশী রেডি ফিড ব্যবহার করা যাবে না।

হাঁসের ডিম সংরক্ষণ

ডিম একটি পুষ্টিকর সম্পূর্ণ খাদ্য এবং প্রোটিনের একটি চমৎকার উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে, অনিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রায় দীর্ঘ সময়ের জন্য ডিম সংরক্ষণের ফলে ডিমের গুণমান খারাপ হয়।

ডিম সংরক্ষণের কয়েকটি পদ্ধতি আছে যেমন ঃ

১. ঠান্ডা জায়গায় ঘরের কাঁচা মেঝেতে গর্ত করে মাটির হাঁড়ি বসাতে হবে। হাঁড়ির চারপাশে কাঠ কয়লা ভিজিয়ে দিলে হাড়ির মধ্যে বেশ ঠান্ডা হবে। হাঁড়ির মধ্যে ডিম রেখে মাটির সরা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এ পদ্ধতিতে বেশ কিছুদিন ডিম ভালো থাকবে।

২. ১৪০ ডিগ্রী ফাঃ তাপমাত্রার গরম পানিতে ১৫ মিনিট ডিম সিদ্ধ করে বেশ কিছুদিন ডিম সংরক্ষণ করা যাবে

৩. ডিমের উপরিভাগের অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র বন্ধ করার জন্য এক মিনিট খাঁটি সরিষার তেলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হবে। এ পদ্ধতিতে ডিম বেশ কিছুদিন ভালো থাকলেও এ ডিমে সরিষার তেলের ঝাঁজ পাওয়া যাবে।

৪. চুনের পানিতে ডিম ডুবিয়ে রেখে ডিমের ছিদ্র বন্ধ করা যাবে। এক্ষেত্রে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে:

১ম ধাপ

একটি পাত্রে ১ লিটার পানি নিয়ে তার মধ্যে ১০০ গ্রাম লবণ গুলে গরম করতে হবে।

২য় ধাপ

লবণ পানি ঠান্ডা হলে তার মধ্যে ২৫০ গ্রাম চুন ভালোভাবে গুলাতে হবে।

৩য় ধাপ

পাত্রটি একদিন রেখে দিলে নিচে তলানি জমবে।

৪র্থ ধাপ

নিচের তলানি না নেড়ে উপরের পরিষ্কার পানি আলাদা পাত্রে ঢেলে নিতে হবে।

৫ম ধাপ

এই পরিষ্কার পানিতে ২০ মিনিট তারের খাঁচায় করে ডিম ডুবাতে হবে।

৬ষ্ঠ ধাপ

খাঁচাসুদ্ধ ডিম ছায়ায় শুকিয়ে নিতে হবে।

সারণি ৯: হাঁসের টিকা প্রদান কর্মসূচি

ক্রমিক নং	টিকার নাম	বয়স	মাত্রা
১.	ডাক প্লেগ	২১-২৫ তম দিন	১ মি.লি. রানের মাংসে
২.	ডাক প্লেগ (বুষ্টার)	বুস্টার ডোজ- ৩৬-৪০তম দিন এর পর ৬-মাস অন্তর অন্তর	১ মি.লি. রানের মাংসে
৩.	ডাক কলেরা	৫৬ তম দিন-১ম ডোজ বুস্টার ডোজ ২ সপ্তাহ পর এরপর ১ বছর পর পর দিতে হবে	১ মি.লি. করে শিরাহীন স্থানে চামড়ার নিচে
৪.	RE-6 (H5N1)	২-৫ সপ্তাহে-১ম ডোজ	০.৫ মি.লি. ঘাড়ের চামড়ার নিচে
৫.	RE-6 (H5N1)	বুস্টার ডোজ-১ম ডোজের ৩-৪ সপ্তাহ পর	১ মি.লি. ঘাড়ের চামড়ার নিচে
৬.	RE-6 (H5N1)	৩য় ডোজ প্রতি ৪-৬ মাস অন্তর অন্তর	১ মি.লি. ঘাড়ের চামড়ার নিচে

হাঁসের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

আবহমান কাল থেকেই গ্রাম বাংলার প্রতি বাড়িতেই কম বেশি হাঁস পালন করে থাকে। হাঁস পালন বর্তমানে খুবই লাভজনক। আমিষের চাহিদা পূরণে হাঁসের ডিম ও মাংসের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশী ও উন্নত জাতের হাঁস পালনে উন্নত ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে যথা সময়ে সঠিক টিকা প্রয়োগ ও উন্নত সংরক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করা একান্ত আবশ্যক। হাঁসের রোগের চিকিৎসা অপেক্ষা প্রতিরোধের উপরই বেশী গুরুত্ব দেয়া উচিত। তবে হাঁস কোন রোগে আক্রান্ত হলে বিশেষ করে ভাইরাস রোগে আক্রান্ত হলে চিকিৎসা করলে কোন লাভ হয় না। তাই প্রতিরোধই একমাত্র উপায়। নিয়মিত প্রতিষেধক টিকা দিয়ে হাঁসের বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

হাঁসের প্রধান প্রধান রোগসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো

ক. ডাক প্লেগ

খ. ডাক কলেরা

ডাক প্লেগ

ডাক প্লেগ Herpes গ্রুপের এক প্রকার ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট হাঁসের মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এটি ডাক ভাইরাস এন্টারাইটিস নামেও পরিচিত। হাঁস যে কোন বয়সেই এ রোগ দ্বারা সংক্রামিত হতে পারে। সাধারণত বিভিন্ন মাধ্যমে একটা হাঁস থেকে অন্য আরেকটা হাঁসে এই রোগের জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে।

ডাক প্লেগ রোগের লক্ষণ

- পা অবশ হয়, দাঁড়াতে পারে না, চুপ করে বসে থাকে।
- পানির পিপাসা বেড়ে যায় ।
- খাওয়া দাওয়া কমে যায়।
- আক্রান্ত হাঁসের চোখ ও নাক দিয়ে তরল পদার্থ নিঃসৃত হয়।
- পানি মিশ্রিত পায়খানা করে তবে কখনও কখনও সবুজ ও হলুদ রংয়েরও হয়ে থাকে।
- অনেক সময় পুরুষ হাঁসের প্রজনন অঙ্গ বেরিয়ে আসে।
- এ রোগে আক্রান্ত হলে ১০০% পর্যন্ত হাঁস মারা যেতে পারে।

চিকিৎসা

ডাক প্লেগ হাঁসের একটি ভাইরাসজনিত রোগ হওয়ায় এই রোগের সুনির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই। তবে সেকেন্ডারি ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য যেকোন একটা এন্টিবায়োটিক যেমন-এনরোফ্লক্সাসিন, নরফ্লক্সাসিন, এমোক্সাসিলিন, নিওমাইসিন সালফেট প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়াও ভিটামিন সি, যেমন-রেনা সি, সিভিট ভেট, ভিটা সি; ইমিউন বুস্টার যেমন- ইমুলাইট, ইমুপ্রো; স্যালাইন ও ডাবের পানি ব্যবহার করা যেতে পারে।

ডাক কলেরা বা ফাউল কলেরা

ডাক কলেরা একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগ যা Pasteurella multocida Type A নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হয়ে থাকে। এটাকে হাঁসের সেপটিসেমিক রোগও বলা হয়। কারণ এই রোগের জীবাণু, আক্রান্ত হাঁসের মল ও পানি দ্বারা ছড়িয়ে পড়ে এবং হাঁসের দেহে প্রবেশ করে রক্তের মধ্যে বিষক্রিয়া ঘটায় এবং সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। সব বয়সের হাঁসে এই রোগ হয়।

ডাক কলেরা রোগের লক্ষণসমূহ

- আক্রান্ত হাঁসের ক্ষুধা মন্দা হয় কিন্তু প্রচুর পানি পান করে ।
- পালকগুলো খসখসে হয়ে যায়, চেহারায় অবসন্নতা আসে ও রক্তশূন্য মনে হয়।
- শ্বাসকষ্ট হওয়ায় মুখ হা করে নিশ্বাস নেয়। পিপাসা বেড়ে যায় ।
- কলেরা আক্রান্ত হবার পর ঝিমায় এবং চলাফেরার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে ।
- আক্রান্ত হাঁস বারবার পাতলা মল ত্যাগ করে এবং ফিকে সবুজ বা হলুদ রংয়ের হয়।
- হাঁস এক জায়গায় ঝিমিয়ে চুপ করে থাকে পরে মারা যায়।

চিকিৎসা: যেহেতু ব্যাকটেরিয়াজনিত তাই এন্টিবায়োটিক যেমন মক্সিলিন সিভি বা মাইক্রোনিড বা কসুমিক্স প্লাস এগুলো ব্যবহার করতে হবে। এছাড়াও রেনা সি, মনোলরিন, ইলেকট্রমিন এগুলো দেওয়া যাবে।

টিকা দেওয়ার সাধারণ নিয়মাবলি

টিকা প্রয়োগের সময় নিম্নোক্ত নিয়মাবলি অবশ্যই মানতে হবে-

- খ্যাতিসম্পন্ন প্রস্তুতকারক এর টিকা সংগ্রহ করতে হবে।
- টিকা ও ডাইলুয়েন্ট উভয়ের মেয়াদোত্তীর্ণ সময়সীমা দেখে নিতে হবে। কোন অবস্থাতেই মেয়াদ উত্তীর্ণ টিকা ব্যবহার করা যাবে না।
- ঘোলাটে ও তলানিযুক্ত ডাইলুয়েন্ট ব্যবহার করা যাবে না।
- দিনের ঠান্ডা আবহাওয়া যেমন-সকাল বা বিকালে টিকা প্রয়োগ করতে হবে।
- টিকা প্রয়োগের যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত হতে হবে।
- টিকা পরিবহনের জন্য অবশ্যই বরফযুক্ত ঠান্ডা বক্স বা ফ্লাক্স ব্যবহার করতে হবে।
- টিকা গুলানোর ১ ঘণ্টার মধ্যেই ব্যবহার করা উচিৎ। অটোমেটিক সিরিঞ্জ দ্বারা টিকা দেয়ায় সময় বাঁচায় ও পরিশ্রম কমায়।
- অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা সঠিক পদ্ধতিতে প্রস্তুতকারকের নির্দেশিত নিয়মে টিকা প্রদান করতে হবে।
- ব্যবহারের পর টিকার বোতল পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- সুস্থ হাঁসকে টিকা দিতে হবে।

টিকা দেওয়ার পরও রোগের কারণ

নিম্নোক্ত কারণে টিকা দেওয়ার পরও রোগ হতে পারে

- রোগের জীবাণু হাঁসের শরীরে আগে থেকেই সুপ্ত অবস্থায় থাকলে তা টিকা প্রয়োগের পর প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরির পূর্বেই আক্রান্ত হতে পারে।
- সঠিক ডোজে এবং সঠিক পথে টিকা না দিলে।
- তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার কারণে টিকা নষ্ট হলে।
- হাঁস অপুষ্টিতে থাকলে শরীর পর্যাপ্ত পরিমাণ এন্টিবডি তৈরী করতে সক্ষম না হলে।
- টিকা প্রয়োগের যন্ত্রপাতি পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত না হলে।
- অদক্ষ ব্যক্তির দ্বারা টিকা দেওয়া হলে।

টিকা সংরক্ষণ

টিকার গুণগত মান সঠিক না থাকলে অর্থাৎ টিকা নিম্নমানের হলে এবং প্রয়োজনীয় টাইটার না থাকলে টিকা প্রয়োগ করে কাজ হবে না। হাঁসের দেহে টিকা প্রয়োগ করার পূর্ব পর্যন্ত টিকা ও ডাইলুয়েন্ট বরফের প্যাকসহ ফ্লাস্কে বহন করতে হবে। তবে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হলে রেফ্রিজারেটরের নরমাল চেম্বারে রাখতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে টিকা এর কার্যকরী ক্ষমতা নষ্ট হবে। লাইভ এবং কিল্ড দুই ধরনের টিকাই ২-৮ ডিগ্রী সেঃ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে। ডিপফ্রিজে রাখা যাবে না।

সাবধানতা

- অসুস্থ হাঁসকে টিকা প্রয়োগ করলে কোন ফল হবে না। বিশেষ কারণ ব্যতিত বিভিন্ন ধরনের টিকা প্রয়োগের মাঝে কমপক্ষে ৭ দিনের ব্যবধান থাকা প্রয়োজন।
- টিকা প্রয়োগের পর খালি শিশি বা বোতল এবং অব্যবহৃত টিকা যেখানে সেখানে না ফেলে মাটির নীচে পুঁতে অথবা পুড়িয়ে দিতে হবে, অন্যথায় ফার্মে রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে।
- টিকা মিশ্রণের সময় ভায়াল রেফ্রিজারেটর থেকে বের করে সাথে সাথে মিশ্রিত না করে টেবিলের উপর বা খালি অবস্থায় বেশিক্ষণ রাখলে টিকার কার্যকরী ক্ষমতা লোপ পায়।
- টিকা মিশ্রণের পর পাত্রটি বরফের একটি পাত্রের উপর রেখে ছায়াযুক্ত এবং ধুলোবালি মুক্ত অবস্থায় টিকা দিতে হবে। অন্যথায় টিকার সঠিক ফল পাওয়া যাবে না।
- ইনজেকশন পদ্ধতিতে টিকা দেওয়ার সময় প্রতি ১০০০টি হাঁসের টিকা দেওয়ার পর সুঁচ বদল করতে হবে।
- টিকা গুলানোর পর সাথে সাথে ব্যবহার করতে হবে, সংরক্ষণ করা যাবে না।
- টিকা প্রয়োগের পূর্বে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে।
- এ সব ছাড়াও সুন্দর স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা (খাদ্য ও বাসস্থান) সুষম খাদ্য এবং পীড়নমুক্ত অবস্থা ইত্যাদি বিষয় টিকার কার্যকারীতা বৃদ্ধিতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে।